মহাত্মা গান্ধী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট. কলিকাতা

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

২৯ মাঘ ১৩৫৪

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

মহাত্মাজি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষ্যে যাহা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও পুস্তিকা হইতে এই গ্রন্থে তাহা সংকলিত হইল।

১৩৩৮ ও ১৩৪৪ সালে শান্তিনিকেতনে মহাত্মাজির জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন তাহাই 'গান্ধীজি' ও 'মহাত্মা গান্ধী' প্রবন্ধের মূল। হিন্দু অনুন্নত শ্রেণীর পৃথক নির্বাচন স্বীকার করিয়া হিন্দুসমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিচ্ছেদকে আইনত স্থায়ী করিবার যে চেষ্টা হয় সেই অকল্যাণের প্রতিবিধান-কল্পে ১৩৩৯ সালের চৌঠা আশ্বিন মহাত্মাজি অনশনব্রত গ্রহণ করেন; সেই সংকটকালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-আশ্রমবাসীদের সম্বোধন করিয়া যাহা বলেন তাহাই 'চৌঠা আশ্বিন' ও 'মহাত্মাজির পুণ্যব্রত' প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। মহাত্মাজির অনশন-সময়ে তাঁহাকে দর্শন করিবার আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ য়েরোডা জেলে গমন করেন এবং তাঁহার ব্রত-উদ্‌যাপনকালে উপস্থিত থাকেন; এই সংকলনের শেষ প্রবন্ধে তাহারই বিবরণ পাওয়া যায়।

মহাত্মাজির আগামী জন্মদিবসে আনন্দোৎসবের অর্ঘ্যরূপে এই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জাতির দুরদৃষ্টক্রমে অশ্রুজলের তর্পণরূপে ইহা উপস্থিত করিতে হইল।

এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ মহাত্মাজির স্মৃতিভাণ্ডারে অর্পিত হইবে।

২৯ মাঘ ১৩৫৪

প্রকাশসূচী

প্রবেশক	বিচিত্রা	ভাদ্র ১৩৩৮
গান্ধী মহারাজ	প্রবাসী	ফাল্গুন ১৩৪৭
মহাত্মা গান্ধী	প্রবাসী	অগ্রহায়ণ ১৩৪৪
গান্ধীজি[১]	প্রবাসী	অগ্রহায়ণ ১৩৩৮
চৌঠা আশ্বিন	বিচিত্রা	কার্তিক ১৩৩৯
মহাত্মাজির পুণ্যব্রত[২]	প্রবাসী	কার্তিক ১৩৩৯
ব্রত-উদ্‌যাপন[৩]	বিচিত্রা	অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

শেষ প্রবন্ধ তিনটি *Mahatmaji and the Depressed Humanity* (December 1932) পুস্তিকায় ইতিপূর্বে সংকলিত হইয়াছিল ; 'চৌঠা আশ্বিন' ও 'মহাত্মাজির শেষ ব্রত' ১৩৩৯ সালে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়াছিল। পুনশ্চ গ্রন্থে সংকলিত 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির অংশবিশেষ এই গ্রন্থের প্রবেশক-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১ 'মহাত্মা গান্ধী' নামে

২ 'মহাত্মাজির শেষ ব্রত' নামে

৩ 'পুণা ভ্রমণ' নামে

সূচীপত্র

প্রার্থনারত গান্ধীজি

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু । শান্তিনিকেতন, ১৯৪৫

ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত. তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে ;
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত. নিশাচর পাখি চীৎকারশব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, 'ভয় নেই, ভাই, মানবকে মহান বলে জেনো।'
ওরা শোনে না। বলে, পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি। বলে, পশুই শাশ্বত।
বলে, সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক।
যখন ওরা আঘাত পায় বিলাপ ক'রে বলে, ভাই, তুমি কোথায়?'
উত্তরে শুনতে পায়, 'আমি তোমার পাশেই।'
অন্ধকারে দেখতে পায় না ; তর্ক করে, এ বাণী ভয়ার্তের মায়াসৃষ্টি,
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা।
বলে, মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসাকণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে।

মেঘ সরে গেল।
শুকতারা দেখা দিল পূর্বদিগন্তে,
পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্মর বনপথে-পথে হিল্লোলিত,
পাখি ডাক দিল শাখায় শাখায়।
ভক্ত বললে, সময় এসেছে।

কিসের সময় ?

যাত্রার।

ওরা বসে ভাবলে।

অর্থ বুঝলে না, আপন আপন মনের মতো অর্থ বানিয়ে নিলে।

ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে ;

বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য।

কে জানে কোথা হতে একটি অতিসূক্ষ্ম স্বর

সবার কানে কানে বললে,

'চলো সার্থকতার তীর্থে।'

এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে

একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠল।

পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুললে।

জোড়হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা।

শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল।

প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে ;

সবাই বলে উঠল, 'ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।'

দয়াহীন দুর্গম পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।

ভক্ত চলেছে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,

তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা
আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারও মনে ক্রোধ, কারও মনে সন্দেহ।
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি।
তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না;
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।
ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে;
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র;
ভয়, পাছে বিলম্ব ক'রে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।
দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সংকেতে ইঙ্গিত করে।
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন
আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে।

রাত হয়েছে।
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়—

যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠল মূর্ছায়।
জনতার মধ্যে থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
'মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।'
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আর-এক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝরনার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
বাতাসে যূথীর মৃদু গন্ধ।

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
মেয়েরা কাঁদছে; পুরুষেরা উত্ত্যক্ত হয়ে ভর্ৎসনা করছে, 'চুপ করো।'
কুকুর ডেকে ওঠে; চাবুক খেয়ে আর্ত কাকুতিতে
তার ডাক থেমে যায়।
রাত্রি পোহাতে চায় না।

অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে তর্ক তীব্র হতে থাকে।
সবাই চীৎকার করে, গর্জন করে ;
শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায়
এমনসময় অন্ধকার ক্ষীণ হল,
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ।
সূর্যরশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে।
কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না ;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।
পরস্পরকে তারা শুধায়, 'কে আমাদের পথ দেখাবে।'
পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে,
"আমরা যাকে মেরেছি সেই-দেখাবে।"
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, 'সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব—
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত,
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।'

সকলে দাঁড়িয়ে উঠল ; কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে,
'জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয় !'

তরুণের দল ডাক দিল, 'চলো যাত্রা করি, প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে।'
হাজার কণ্ঠের ধ্বনিনির্ঝরে ঘোষিত হল,
'আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।'
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক ;
মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেছে সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।
তারা আর পথ শুধায় না ; তাদের মনে নেই সংশয়,
চরণে নেই ক্লান্তি।
মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে ;
সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে
এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম।
তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল,
সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে যেখানে শস্য হয়েছে সঞ্চিত,
সেই অনুর্বর ভূমির উপর দিয়ে
যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল ;
তারা চলেছে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে ;
চলেছে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে
যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ ;
চলেছে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে
আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।

রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে পথে।

সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়,

'ওই কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণচূড়া।'

সে বলে, 'না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভা।'

তরুণ বলে, 'থেমো না, বন্ধু, অন্ধতমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে

আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।'

অন্ধকারে তারা চলে।

পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে।

পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।

স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সংগীতে বলে, 'সাথি, অগ্রসর হও।'

অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, 'আর বিলম্ব নেই।'

গান্ধী মহারাজ

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ বা ধনী, কেউ বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।
ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
'ঐ যে তোমার চোখ-রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।'

মহাত্মা গান্ধী

সিধে ভাষায় বলি কথা,
স্বচ্ছ তাহার সরলতা,
ডিপ্লম্যাসির নাইকো অসুবিধে।
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয় না কথার পাকে,
জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে।
দলে দলে হরিণবাড়ি
চলল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ—
চিরকালের হাতকড়ি যে
ধুলায় খসে পড়ল নিজে,
লাগল ভালে গান্ধীরাজের ছাপ।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৩ ডিসেম্বর ১৯৪০

মহাত্মা গান্ধী

ভারতবর্ষের একটি সম্পূর্ণ ভৌগোলিক মূর্তি আছে। এর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে-একটি সম্পূর্ণতা বিদ্যমান, প্রাচীন কালে তার ছবি অন্তরে গ্রহণ করার ইচ্ছে দেশে ছিল, দেখতে পাই। একসময়, দেশের মনে নানা কালে নানা স্থানে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তা সংগ্রহ ক'রে, এক ক'রে দেখবার চেষ্টা, মহাভারতে খুব সুস্পষ্ট ভাবে জাগ্রত দেখি। তেমনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক স্বরূপকে অন্তরে উপলব্ধি করবার একটি অনুষ্ঠান ছিল, সে তীর্থভ্রমণ। দেশের পূর্বতম অঞ্চল থেকে পশ্চিমতম অঞ্চল এবং হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সর্বত্র এর পবিত্র পীঠস্থান রয়েছে, সেখানে তীর্থ স্থাপিত হয়ে একটি ভক্তির ঐক্যজালে সমস্ত ভারতবর্ষকে মনের ভিতরে আনবার সহজ উপায় সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। এ'কে সম্পূর্ণ ভাবে মনের ভিতর গ্রহণ করা প্রাচীন কালে সম্ভবপর ছিল না। আজ সার্ভে ক'রে, মানচিত্র এঁকে, ভূগোলবিবরণ গ্রথিত ক'রে ভারতবর্ষের যে ধারণা মনে আনা সহজ হয়েছে, প্রাচীন কালে তা ছিল না। এক হিসাবে সেটা ভালোই ছিল। সহজ ভাবে যা পাওয়া যায়

মনের ভিতরে তা গভীর ভাবে মুদ্রিত হয় না। সেই জন্য কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে ভারত-পরিক্রমা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হত তা সুগভীর, এবং মন থেকে সহজে দূর হত না।

মহাভারতের মাঝখানে গীতা প্রাচীনের সেই সমন্বয়তত্ত্বকে উজ্জ্বল করে। কুরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে এই-যে খানিকটা দার্শনিক ভাবে আলোচনা, এটাকে কাব্যের দিক থেকে অসংগত বলা যেতে পারে; এমনও বলা যেতে পারে যে, মূল মহাভারতে এটা ছিল না। পরে যিনি বসিয়েছেন তিনি জানতেন যে, উদার কাব্য-পরিধির মধ্যে, ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করার প্রয়োজন ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করবার প্রয়াস ছিল ধর্মানুষ্ঠানেরই অন্তর্গত। মহাভারতপাঠ যে আমাদের দেশে ধর্মকর্মের মধ্যে গণ্য হয়েছিল তা কেবল তত্ত্বের দিক থেকে নয়, দেশকে উপলব্ধি করার জন্যও এর কর্তব্যতা আছে। আর, তীর্থযাত্রীরাও ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে দেশকে স্পর্শ করতে করতে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে ক্রমশ এর ঐক্যরূপ মনের ভিতরে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন।

এ হল পুরাতন কালের কথা।

পুরাতন কালের পরিবর্তন হয়েছে। আজকাল দেশের মানুষ আপনার প্রাদেশিক কোণের ভিতর সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সংস্কার ও লোকাচারের জালে আমরা জড়িত, কিন্তু

মহাভারতের প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটা মুক্তির হাওয়া আছে। এই মহাকাব্যের বিরাট প্রাঙ্গণে মনস্তত্ত্বের কত পরীক্ষা। যাকে আমরা সাধারণত নিন্দনীয় বলি, সেও এখানে স্থান পেয়েছে। যদি আমাদের মন প্রস্তুত থাকে, তবে অপরাধ দোষ সমস্ত অতিক্রম ক'রে মহাভারতের বাণী উপলব্ধি করতে পারা যেতে পারে। মহাভারতে একটা উদাত্ত শিক্ষা আছে ; সেটা নঙর্থক নয়, সদর্থক, অর্থাৎ তার মধ্যে একটা হাঁ আছে। বড়ো বড়ো সব বীরপুরুষ আপন মাহাত্ম্যের গৌরবে উন্নতশির, তাঁদেরও দোষ ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সেই-সমস্ত দোষ ত্রুটিকে আত্মসাৎ করেই তাঁরা বড়ো হয়ে উঠেছেন। মানুষকে যথার্থ ভাবে বিচার করবার এই প্রকাণ্ড শিক্ষা আমরা মহাভারত থেকে পাই।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ হবার পর থেকে আরও কিছু চিন্তনীয় বিষয় এসে পড়েছে যেটা আগে ছিল না। পুরাকালের ভারতে দেখি স্বভাবত বা কার্যত যারা পৃথক তাদের আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তবু খণ্ডিত করেও একটা ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা ছিল। সহসা পশ্চিমের সিংহদ্বার ভেদ ক'রে শত্রুর আগমন হল। আর্যরা ওই পথেই এসে একদিন পঞ্চনদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, এবং তার পরে বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে নিজেদের পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। ভারত তখন গান্ধার প্রভৃতি

পারিপার্শ্বিক প্রদেশ-সুদ্ধ একটি সমগ্র সংস্কৃতিতে পরিবেষ্টিত থাকায়, বাইরের আঘাত লাগে নি। তার পরে একদিন এল বাইরের থেকে সংঘাত। সে সংঘাত বিদেশীয়; তাদের সংস্কৃতি পৃথক। যখন তারা এল তখন দেখা গেল যে, আমরা একত্র ছিলুম, অথচ এক হই নি। তাই সমস্ত ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের একটা প্লাবন বয়ে গেল। তার পর থেকে আমাদের দিন কাটছে দুঃখ ও অপমানের গ্লানিতে। বিদেশী আক্রমণের সুযোগ নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে কেউ, কেউ বা খণ্ড খণ্ড জায়গায় বিশৃঙ্খল ভাবে বিদেশীদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্যে। কিছুতেই তো সফলকাম হওয়া গেল না। রাজপুতনায়, মারাঠায়, বাংলাদেশে, যুদ্ধবিগ্রহ অনেক কাল শান্ত হয় নি। এর কারণ এই যে, যত বড়ো দেশ ঠিক তত বড়ো ঐক্য হল না; দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়ে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করলেম বহু শতাব্দী পরে। বিদেশী আক্রমণের পথ প্রশস্ত হল এই অনৈক্যের সুবিধা নিয়ে। নিকটের শত্রুর পর হুড়্‌মুড়্‌ করে এসে পড়ল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশী শত্রু তাদের বাণিজ্যতরী নিয়ে; এল পর্টুগীজ, এল ওলন্দাজ, এল ফ্রেঞ্চ্‌, এল ইংরেজ। সকলে এসে সবলে ধাক্কা মারলে; দেখতে পেল যে, এমন কোনো বেড়া নেই যেটা দুর্লঙ্ঘ্য। আমাদের সম্পদ সম্বল সব দিতে লাগলুম,

আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষীণতা এল, চিত্তের দিক দিয়ে সম্বলহীন রিক্ত হয়ে পড়লুম। এমনি করেই বাইরের নিঃস্বতা ভিতরেও নিঃস্বতা আনে।

এইরকম দুঃসময়ে আমাদের সাধক পুরুষদের মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল সেটা হচ্ছে, পরমার্থের প্রতি লক্ষ রেখে ভারতের স্বাতন্ত্র্য উদ্‌বোধিত করার একটা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা। তখন থেকে আমাদের সমস্ত মন গেছে পারমার্থিক পুণ্য-উপার্জনের দিকে। আমাদের পার্থিব সম্পদ পৌঁছয় নি সেখানে যেখানে যথার্থ দৈন্য, ও শিক্ষার অভাব। পারমার্থিক সম্বলটুকুর লোভে যে পার্থিব সম্বল খরচ করি সেটা যায় মোহান্ত ও পাণ্ডাদের গর্বস্ফীত জঠরের মধ্যে। এতে ভারতের ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে না।

বিপুল ভারতবর্ষের বিরাট জনসমাজের মধ্যে আর-এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা জপ তপ ধ্যান ধারণা করার জন্যে মানুষকে পরিত্যাগ ক'রে দারিদ্র্য ও দুঃখের হাতে সংসারকে ছেড়ে দিয়ে চলে যান। এই অসংখ্য উদাসীনমণ্ডলীর এই মুক্তিকামীদের অন্ন জুটিয়েছে তারা যারা এঁদের মতে মোহগ্রস্ত সংসারাসক্ত। একবার কোনো গ্রামের মধ্যে এইরকম এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁকে বলেছিলুম, 'গ্রামের মধ্যে দুষ্কৃতিকারী, দুঃখী, পীড়াগ্রস্ত যারা আছে, এদের জন্যে আপনারা কিছু করবেন না কেন?' আমার এই প্রশ্ন শুনে তিনি বিস্মিত ও

বিরক্ত হয়েছিলেন ; বললেন, 'কী ! যারা সাংসারিক মোহগ্রস্ত লোক, তাদের জন্যে ভাবতে হবে আমায় ! আমি একজনা সাধক, বিশুদ্ধ আনন্দের জন্যে ওই সংসার ছেড়ে এসেছি, আবার ওর মধ্যে নিজেকে জড়াব !' এই কথাটি যিনি বলেছিলেন তাঁকে এবং তাঁরই মতো অন্য-সকল সংসারে-বীতস্পৃহ উদাসীনদের ডেকে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয় যে, তাঁদের তৈলচিক্কণ নধর কান্তির পরিপুষ্টি সাধন করল কে ? যাদেরকে ওঁরা পাপী ও হেয় ব'লে ত্যাগ করে এসেছেন সেই সংসারী লোকই ওঁদের অন্ন জুটিয়েছে। পরলোকের দিকে ক্রমাগত দৃষ্টি দিয়ে কতখানি শক্তির অপচয় হয়েছে তা বলা যায় না। বহু শতাব্দী ধ'রে ভারতের এই দুর্বলতা চলে আসছে। এর যা শাস্তি, ইহলোকের বিধাতা সে শাস্তি আমাদের দিয়েছেন। তিনি আমাদের হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছেন সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, এই সংসারের উপযোগী হতে হবে। সে হুকুমের অবমাননা করেছি, সুতরাং শাস্তি পেতেই হবে।

সম্প্রতি ইউরোপে স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা চলেছে। ইতালি এক সময়ে বিদেশীর কবলে ধিক্কৃত জীবন যাপন করেছিল ; তার পরে ইতালির ত্যাগী যাঁরা, যাঁরা বীর, ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি, বিদেশীর অধীনতা-জাল থেকে মুক্তিদান ক'রে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। আমেরিকার যুক্ত-

রাষ্ট্রেও দেখেছি এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্যে কত দুঃখ, কত চেষ্টা, কত সংগ্রাম হয়েছে। মানুষকে মনুষ্যোচিত অধিকার দেবার জন্যে পাশ্চাত্য দেশে কত লোক আপনাদের বলি দিয়েছে। বিভাগ সৃষ্টি ক'রে পরস্পরকে যে অপমান করা হয়, সেটার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যে আজও বিদ্রোহ চলছে। ও দেশের কাছে জনসাধারণ, সর্বসাধারণ, মানবগৌরবের অধিকারী ; কাজেই রাষ্ট্রতন্ত্রের যাবতীয় অধিকার সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ও দেশের আইনের কাছে ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ নেই। একতাবদ্ধ হয়ে স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার শিক্ষা আমরা পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে পেয়েছি। সমস্ত ভারতবাসী যাতে আপন দেশকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পায়, এই-যে ইচ্ছে এটা আমরা পশ্চিম থেকে পেয়েছি। এত দিন ধরে আমরা নিজেদের গ্রাম ও প্রতিবাসীদের নিয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছোটোখাটো ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর কাজ করেছি ও চিন্তা করেছি। গ্রামে জলাশয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে নিজেদের সার্থক মনে করেছি, এবং এই গ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বা মাতৃভূমি বলেছি। ভারতকে মাতৃভূমি ব'লে স্বীকার করার অবকাশ হয় নি। প্রাদেশিকতার জালে জড়িত ও দুর্বলতায় অভিভূত হয়ে আমরা যখন পড়ে ছিলুম তখন রানাডে, সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে প্রমুখ মহদাশয় লোকেরা এলেন জনসাধারণকে গৌরব দান করার জন্যে। তাঁদের আরব্ধ সাধনাকে

যিনি প্রবল শক্তিতে দ্রুত বেগে আশ্চর্য সিদ্ধির পথে নিয়ে গেছেন সেই মহাত্মার কথা স্মরণ করতে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি— তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী।

অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ইনিই কি প্রথম এলেন? তার পূর্বে কংগ্রেসের ভিতরে কি আরও অনেকে কাজ করেন নি? কাজ করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁদের নাম করলেই দেখতে পাই যে, কত ম্লান তাঁদের সাহস, কত ক্ষীণ তাঁদের কণ্ঠধ্বনি।

আগেকার যুগে কংগ্রেসওয়ালারা আমলাতন্ত্রের কাছে কখনও নিয়ে যেতেন আবেদন-নিবেদনের ডালা, কখনও বা করতেন চোখরাঙানির মিথ্যে ভান। ভেবেছিলেন তাঁরা যে, কখনও তীক্ষ্ণ কখনও সুমধুর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে তাঁরা ম্যাজিনি-গ্যারিবল্ডির সমগোত্রীয় হবেন। সে ক্ষীণ অবাস্তব শৌর্য নিয়ে আজ আমাদের গৌরব করার মতো কিছুই নেই। আজ যিনি এসেছেন তিনি রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কলুষ থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রতন্ত্রের অনেক পাপ ও দোষের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দোষ হল এই স্বার্থান্বেষণ। হোক-না রাষ্ট্রীয় স্বার্থ খুব বড়ো স্বার্থ, তবু স্বার্থের যা পঙ্কিলতা তা তার মধ্যে না এসে পারেই না। পোলিটিশ্যান ব'লে একটা জাত আছে, তাদের আদর্শ বড়ো আদর্শের সঙ্গে মেলে না। তারা অজস্র মিথ্যা বলতে পারে; তারা এত হিংস্র যে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দেবার অছিলায় অন্য দেশ অধিকার করার লোভ ত্যাগ

করতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে দেখি, এক দিকে তারা দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পেরেছে, অন্য দিকে আবার দেশের নাম ক'রে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশ একদিন যে মুষল প্রসব করেছে আজ তারই শক্তি ইউরোপের মস্তকের উপর উদ্যত হয়ে আছে। আজকে এমন অবস্থা হয়েছে যে সন্দেহ হয়, আজ বাদে কাল ইউরোপীয় সভ্যতা টিকবে কি না। তারা যাকে পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ বলছে সেই পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ই তাদের নিঃশেষে মারবে। তারা যখন মরবে তখন অবশ্য আমাদের মতো নির্জীব ভাবে মরবে না, ভয়ংকর অগ্নি উৎপাদন ক'রে একটা ভীষণ প্রলয়ের মধ্যে তারা মরবে।

আমাদের মধ্যেও অসত্য এসেছে; দলাদলির বিষ ছড়িয়েছেন পোলিটিশ্যানের জাতীয় যাঁরা। আজ এই পলিটিক্স্‌ থেকেই ছাত্রছাত্রীর মধ্যেও দলাদলির বিষ প্রবেশ করেছে। পোলিটিশ্যানরা কেজো লোক: তাঁরা মনে করেন যে, কার্য উদ্ধার করতে হলে মিথ্যার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিধাতার বিধানে সে ছলচাতুরী ধরা পড়বে। পোলিটিশ্যানদের, এ-সব চতুর বিষয়ীদের, আমরা প্রশংসা করতে পারি কিন্তু ভক্তি করতে পারি না। ভক্তি করতে পারি মহাত্মাকে, যাঁর সত্যের সাধনা আছে। মিথ্যার সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি সত্যের সার্বভৌমিক

ধর্মনীতিকে অস্বীকার করেন নি। ভারতের যুগসাধনায় এ একটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই একটি লোক যিনি সত্যকে সকল অবস্থায় মেনেছেন, তাতে আপাতত সুবিধে হোক বা না হোক; তাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে মহৎ দৃষ্টান্ত। পৃথিবীতে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য -লাভের ইতিহাস রক্তধারায় পঙ্কিল, অপহরণ ও দস্যুবৃত্তির দ্বারা কলঙ্কিত। কিন্তু পরস্পরকে হনন না ক'রে, হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় না নিয়েও যে স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে, তিনি তার পথ দেখিয়েছেন। লোকে অপহরণ করেছে, বিজ্ঞান দস্যুবৃত্তি করেছে দেশের নামে। দেশের নাম নিয়ে এই-যে তাদের গৌরব, এ গর্ব টিকবে না তো। আমাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁরা হিংস্রতাকে মন থেকে দূর করে দেখতে পারেন। এই হিংসা-প্রবৃত্তি স্বীকার না করেও আমরা জয়ী হব, এ কথা আমরা মানি কি? মহাত্মা যদি বীরপুরুষ হতেন কিংবা লড়াই করতেন তবে আমরা এমনি করে আজ ওঁকে স্মরণ করতুম না। কারণ, লড়াই করার মতো বীরপুরুষ এবং বড়ো বড়ো সেনাপতি পৃথিবীতে অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন। মানুষের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ, নৈতিক যুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধের ভিতরেও নিষ্ঠুরতা আছে, তা গীতা ও মহাভারতে পেয়েছি। তার মধ্যে বাহুবলেরও স্থান আছে কি না এ নিয়ে শাস্ত্রের তর্ক তুলব না। কিন্তু এই-যে একটা অনুশাসন, মরব

তবু মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব— এ একটা মস্ত বড়ো কথা, একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্যোদ্ধারের বৈষয়িক পরামর্শ নয়। ধর্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়, হেরে গিয়েও জয় করবার জন্য। অধর্মযুদ্ধে মরাটা মরা। ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে; হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন, তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য।

এর মূলে একটা শিক্ষার ধারা আছে। ইউরোপে আমরা স্বাধীনতার কলুষ ও স্বাদেশিকতার বিষাক্ত রূপ দেখতে পাই। অবশ্য, আরম্ভে তারা অনেক ফল পেয়েছে, অনেক ঐশ্বর্য লাভ করেছে। সেই পাশ্চাত্য দেশে খৃস্টধর্মকে শুধু মৌখিক ভাবে গ্রহণ করেছে। খৃস্টধর্মে মানবপ্রেমের বড়ো উদাহরণ আছে: ভগবান মানুষ হয়ে মানুষের দেহে যত দুঃখ পাপ সব আপন দেহে স্বীকার করে নিয়ে মানুষকে বাঁচিয়েছেন— এই ইহলোকেই, পরলোকে নয়। যে সকলের চেয়ে দরিদ্র তাকে বস্ত্র দিতে হবে, যে নিরন্ন তাকে অন্ন দিতে হবে, এ কথা খৃস্টধর্মে যেমন সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে এমন আর কোথাও নয়।

মহাত্মাজি এমন একজন খৃস্টসাধকের সঙ্গে মিলতে পেরেছিলেন, যাঁর নিয়ত প্রচেষ্টা ছিল মানবের ন্যায্য অধিকারকে বাধামুক্ত করা। সৌভাগ্যক্রমে সেই ইউরোপীয় ঋষি টলস্টয়ের

কাছ থেকে মহাত্মা গান্ধী খৃস্টানধর্মের অহিংস্রনীতির বাণী যথার্থ ভাবে লাভ করেছিলেন। আরও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ বাণী এমন একজন লোকের যিনি সংসারের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে এই অহিংস্রনীতির তত্ত্ব আপন চরিত্রে উদ্ভাবিত করেছিলেন। মিশনারি অথবা ব্যবসায়ী প্রচারকের কাছে মানবপ্রেমের বাঁধা বুলি তাঁকে শুনতে হয় নি। খৃস্টবাণীর এই একটি বড়ো দান আমাদের পাবার অপেক্ষা ছিল। মধ্যযুগে মুসলমানদের কাছ থেকেও আমরা একটি দান পেয়েছি। দাদূ, কবীর, রজ্জব প্রভৃতি সাধুরা প্রচার করে গিয়েছেন যে, যা নির্মল, যা মুক্ত, যা আত্মার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, তা রুদ্ধদ্বার মন্দিরে কৃত্রিম অধিকারীবিশেষের জন্যে পাহারা-দেওয়া নয়; তা নির্বিচারে সর্ব মানবেরই সম্পদ। যুগে যুগে এইরূপই ঘটে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা সমস্ত পৃথিবীর দানকে আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই গ্রহণ করেন, এবং গ্রহণ করার দ্বারা তাকে সত্য করে তোলেন। আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই পৃথুরাজা পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন রত্ন আহরণ করবার জন্যে। যাঁরা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তাঁরা সকল ধর্ম ইতিহাস ও নীতি থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণ করেন।

খৃস্টবাণীর শ্রেষ্ঠ নীতি বলে যে, যারা নম্র তারা জয়ী হয়; আর খৃস্টানজাতি বলে, নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যের দ্বারা জয়লাভ করা যায়। এর মধ্যে কে জয়ী হবে ঠিক করে জানা যায় নি; কিন্তু উদাহরণ-

স্বরূপ দেখা যায় যে, ঔদ্ধত্যের ফলে ইউরোপে কী মহামারীই না হচ্ছে। মহাত্মা নম্র অহিংস্রনীতি গ্রহণ করেছেন, আর চতুর্দিকে তাঁর জয় বিস্তীর্ণ হচ্ছে। তিনি যে নীতি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করছেন, সম্পূর্ণ পারি বা না পারি, সে নীতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমাদের অন্তরে ও আচরণে রিপু ও পাপের সংগ্রাম আছে, তা সত্ত্বেও পুণ্যের তপস্যার দীক্ষা নিতে হবে সত্যব্রত মহাত্মার নিকটে। আজকের দিন স্মরণীয় দিন, কারণ সমস্ত ভারতে রাষ্ট্রীয় মুক্তির দীক্ষা ও সত্যের দীক্ষা এক হয়ে গেছে সর্বসাধারণের কাছে।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন ১৩৪৪

গান্ধীজি

আজ মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসে আশ্রমবাসী আমরা সকলে আনন্দোৎসব করব। আমি আরম্ভের সুরটুকু ধরিয়ে দিতে চাই।

আধুনিক কালে এই রকমের উৎসব অনেকখানি বাহ্য অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। খানিকটা ছুটি ও অনেকখানি উত্তেজনা দিয়ে এটা তৈরি। এইরকম চাঞ্চল্যে এই-সকল উপলক্ষ্যের গভীর তাৎপর্য অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করবার সুযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

ক্ষণজন্মা লোক যাঁরা তাঁরা শুধু বর্তমান কালের নন। বর্তমানের ভূমিকার মধ্যে ধরাতে গেলে তাঁদের অনেকখানি ছোটো করে আনতে হয়, এমনি করে বৃহৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে যে শাশ্বত মূর্তি প্রকাশ পায় তাকে খর্ব করি। আমাদের আশু প্রয়োজনের আদর্শে তাঁদের মহত্ত্বকে নিঃশেষিত করে বিচার করি। মহাকালের পটে যে ছবি ধরা পড়ে, বিধাতা তার থেকে প্রাত্যহিক জীবনের আত্মবিরোধ ও আত্মখণ্ডনের অনিবার্য কুটিল ও বিচ্ছিন্ন রেখাগুলি মুছে দেন, যা আকস্মিক ও ক্ষণকালীন তাকে বিলীন করেন ; আমাদের প্রণম্য যাঁরা তাঁদের একটি সংহত সম্পূর্ণ মূর্তি

সংসারে চিরন্তন হয়ে থাকে। যাঁরা আমাদের কালে জীবিত তাঁদেরকেও এই ভাবে দেখবার প্রয়াসেই উৎসবের সার্থকতা।

আজকের দিনে ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রিক বিরোধ পরশুদিন হয়তো তা থাকবে না, সাময়িক অভিপ্রায়গুলি সময়ের স্রোতে কোথায় লুপ্ত হবে। ধরা যাক্, আমাদের রাষ্ট্রিক সাধনা সফল হয়েছে, বাহিরের দিক থেকে চাইবার আর কিছুই নেই, ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করল— তৎসত্ত্বেও আজকের দিনের ইতিহাসের কোন্ আত্মপ্রকাশটি ধূলির আকর্ষণ বাঁচিয়ে উপরে মাথা তুলে থাকবে সেইটিই বিশেষ করে দেখবার যোগ্য। সেই দিক থেকে যখন দেখতে যাই তখন বুঝি, আজকের উৎসবে যাঁকে নিয়ে আমরা আনন্দ করছি তাঁর স্থান কোথায়, তাঁর বিশিষ্টতা কোন্খানে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনসিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না, যে দৃঢ়শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবল ভাবে সচেতন করেছেন সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি, সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে; কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর জন্মান্তর ঘটে গেল। ইনি আসবার পূর্বে, দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত ছিল; কেবল ছিল অন্যের অনুগ্রহের জন্য আবদার আবেদন, মজ্জায় মজ্জায় আপনার 'পরে আস্থাহীনতার দৈন্য।

মহাত্মা গান্ধী

ভারতবর্ষের বাহির থেকে যারা আগন্তুকমাত্র তাদেরই প্রভাব হবে বলশালী, দেশের ইতিহাস বেয়ে যুগপ্রবাহিত ভারতের প্রাণধারা চিত্তধারা সেইটেই হবে ম্লান, যেন সেইটেই আকস্মিক— এর চেয়ে দুর্গতির কথা আর কী হতে পারে। সেবার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, দেশকে ঘনিষ্ঠ ভাবে উপলব্ধি করবার বাধা ঘটাতে যথার্থই আমরা পরবাসী হয়ে পড়েছি। শাসনকর্তাদের শিক্ষাপ্রণালী রাষ্ট্রব্যবস্থা, ওদের তলোয়ার বন্দুক নিয়ে, ভারতে ওরাই হল মুখ্য ; আর আমরাই হলুম গৌণ— মোহাভিভূত মনে এই কথাটির স্বীকৃতি অল্প কাল পূর্ব পর্যন্ত আমাদের সকলকে তামসিকতায় জড়বুদ্ধি করে রেখেছিল। স্থানে স্থানে লোকমান্য তিলকের মতো জনকতক সাহসী পুরুষ জড়ত্বকে প্রাণপণে আঘাত করেছেন, এবং আত্মশ্রদ্ধার আদর্শকে জাগিয়ে তোলবার কাজে ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এই আদর্শকে বিপুল ভাবে প্রবল প্রভাবে প্রয়োগ করলেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতবর্ষের স্বকীয় প্রতিভাকে অন্তরে উপলব্ধি করে তিনি অসামান্য তপস্যার তেজে নূতন যুগগঠনের কাজে নামলেন। আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অভিযান এত দিনে যথোপযুক্ত রূপে আরম্ভ হল।

এত কাল আমাদের নিঃসাহসের উপরে দুর্গ বেঁধে বিদেশী বণিকরাজ সাম্রাজ্যিকতার ব্যাবসা চালিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত

ভালো করে দাঁড়াবার জায়গা পেত না যদি আমাদের দুর্বলতা তাকে আশ্রয় না দিত। পরাভবের সব চেয়ে বড়ো উপাদান আমরা নিজের ভিতর থেকেই জুগিয়েছি। এই আমাদের আত্ম-কৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজি; নববীর্যের অনুভূতির বন্যাধারা ভারতবর্ষে প্রবাহিত করলেন। এখন শাসনকর্তারা উদ্যত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করতে; কেননা তাঁদের পরশাসনতন্ত্রের গভীরতর ভিত্তি টলেছে, যে ভিত্তি আমাদের বীর্যহীনতায়। আমরা অনায়াসে আজ জগৎসমাজে আমাদের স্থান দাবি করছি।

তাই আজ আমাদের জানতে হবে, যে মানুষ বিলেতে গিয়ে রাউণ্ড্ টেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্সে তর্কযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, যিনি খদ্দর চরকা প্রচার করেন, যিনি প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রপাতিতে বিশ্বাস করেন বা করেন না— এই-সব মতামত ও কর্মপ্রণালীর মধ্যে যেন এই মহাপুরুষকে সীমাবদ্ধ করে না দেখি। সাময়িক যে-সব ব্যাপারে তিনি জড়িত তাতে তাঁর ত্রুটিও ঘটতে পারে, তা নিয়ে তর্কও চলতে পারে— কিন্তু, এহ বাহ্য। তিনি নিজে বারংবার স্বীকার করেছেন, তাঁর ভ্রান্তি হয়েছে; কালের পরিবর্তনে তাঁকে মত বদলাতে হয়েছে। কিন্তু এই-যে অবিচলিত নিষ্ঠা যা তাঁর সমস্ত জীবনকে অচলপ্রতিষ্ঠ করে তুলেছে, এই-যে অপরাজেয় সংকল্পশক্তি, এ তাঁর সহজাত,

কর্ণের সহজাত কবচের মতো— এই শক্তির প্রকাশ মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদ। প্রয়োজনের সংসারে নিত্য-পরিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে, কিন্তু সকল প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যে মহাজীবনের মহিমা আজ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হল তাকেই যেন আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি।

মহাত্মাজির জীবনের এই তেজ আজ সমগ্র দেশে সঞ্চারিত হয়েছে, আমাদের ম্লানতা মার্জনা করে দিচ্ছে। তাঁর এই তেজোদ্দীপ্ত সাধকের মূর্তিই মহাকালের আসনকে অধিকার করে আছেন। বাধা-বিপত্তিকে তিনি মানেন নি, নিজের ভ্রমে তাঁকে খর্ব করে নি, সাময়িক উত্তেজনার ভিতরে থেকেও তার ঊর্ধ্বে তাঁর মন অপ্রমত্ত। এই বিপুল চরিত্রশক্তির আধার যিনি তাঁকেই আজ তাঁর জন্মদিনে আমরা নমস্কার করি।

পরিশেষে আমার বলবার কথা এই যে, পূর্বপুরুষের পুনরাবৃত্তি করা মনুষ্যধর্ম নয়। জীবজন্তু তাদের জীর্ণ অভ্যাসের বাসাকে আঁকড়ে ধরে থাকে; মানুষ যুগে যুগে নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে, পুরাতন সংস্কারে কোনো দিন তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। মহাত্মাজি ভারতবর্ষের বহুযুগব্যাপী অন্ধতা মূঢ় আচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ এক দিক থেকে জাগিয়ে তুলেছেন, আমাদের সাধনা হোক সকল দিক থেকেই তাকে প্রবল করে তোলা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, মূঢ় সংস্কারের আবর্তে যত

দিন আমরা চালিত হতে থাকব তত দিন কার সাধ্য আমাদের মুক্তি দেয়। কেবল ভোটের সংখ্যা এবং পরস্পরের স্বত্বের চুলচেরা হিসাব গণনা করে কোনো জাত দুর্গতি থেকে উদ্ধার পায় না। যে জাতির সামাজিক ভিত্তি বাধায় বিরোধে শতছিদ্র হয়ে আছে, যারা পঞ্জিকায় ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জনা বহন করে বেড়ায়, বিচার-শক্তিহীন মূঢ় চিত্তে বিশেষ ক্ষণের বিশেষ জলে পুরুষানুক্রমিক পাপক্ষালন করতে ছোটে, যারা আত্মবুদ্ধি-আত্মশক্তির অবমাননাকে আপ্তবাক্যের নাম দিয়ে আদরে পোষণ করছে, তারা কখনও এমন সাধনাকে স্থায়ী ও গভীর ভাবে বহন করতে পারে না যে সাধনায় অন্তরে বাহিরে পরদাসত্বের বন্ধন ছেদন করতে পারে, যার দ্বারা স্বাধীনতার দুরূহ দায়িত্বকে সকল শত্রুর হাত থেকে দৃঢ় শক্তিতে রক্ষা করতে পারে। মনে রাখা চাই, বাহিরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে তেমন বীর্যের দরকার হয় না, আপন অন্তরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই মনুষ্যত্বের চরম পরীক্ষা। আজ যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করছি এই পরীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েছেন; তাঁর কাছ থেকে সেই দুরূহ সংগ্রামে জয়ী হবার সাধনা যদি দেশ গ্রহণ না করে তবে আজ আমাদের প্রশংসাবাক্য, উৎসবের আয়োজন, সম্পূর্ণ ই ব্যর্থ হবে। আমাদের সাধনা আজ আরম্ভ হল মাত্র। দুর্গম পথ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে।

শান্তিনিকেতন
১৫ আশ্বিন ১৩৩৮

চৌঠা আশ্বিন

সূর্যের পূর্ণগ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করছে। এমন সর্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটে নি, পরম শোকে এই আমাদের মহৎসান্ত্বনা। দেশের আপামর সাধারণকে আজকের দিনের বেদনা স্পর্শ করেছে। যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থ ভাবে, গভীর ভাবে, আপন করে নিয়েছেন. সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন।

দেশকে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে যারা বাহুবলে অধিকার করে, যত বড়ো হোক-না তাদের প্রতাপ, যেখানে দেশের প্রাণবান সত্তা সেখানে তাদের প্রবেশ অবরুদ্ধ। দেশের অন্তরে সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমি জয় করবে এমন শক্তি নেই তাদের। অস্ত্রের জোরে ভারতবর্ষকে অধিকার করেছে কত বিদেশী কত-বার। মাটিতে রোপণ করেছে তাদের পতাকা, আবার সে পতাকা মাটিতে পড়ে ধুলো হয়ে গেছে।

অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবেড়া দিয়ে যারা বিদেশে আপন স্বত্বকে স্থায়ী করবার দুরাশা মনে লালন করে, একদিন কালের

আহ্বানে যে মুহূর্তে তারা নেপথ্যে সরে দাঁড়ায়, তখনই ইঁটকাঠের ভগ্নস্তূপে পুঞ্জীভূত হয় তাদের কীর্তির আবর্জনা। আর যাঁরা সত্যের বলে বিজয়ী তাঁদের আধিপত্য তাঁদের আয়ুকে অতিক্রম করে দেশের মর্মস্থানে বিরাজ করে।

দেশের সমগ্র চিত্তে যাঁর এই অধিকার তিনি সমস্ত দেশের হয়ে আজ আরও একটি জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, চরম আত্মোৎসর্গের পথে। কোন্ দুরূহ বাধা তিনি দূর করতে চান, যার জন্যে তিনি এত বড়ো মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হলেন না, সেই কথাটি আজ আমাদের স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করবার দিন।

আমাদের দেশে একটি ভয়ের কারণ আছে। যে পদার্থ মানসিক তাকে আমরা বাহ্যিক দক্ষিণা দিয়ে সুলভ সম্মানে বিদায় করি। চিহ্নকে বড়ো করে তুলে সত্যকে খর্ব করে থাকি। আজ দেশনেতারা স্থির করেছেন যে, দেশের লোকেরা উপবাস করবে। আমি বলি, এতে দোষ নেই, কিন্তু ভয় হয় : মহাত্মাজি যে প্রাণপণ মূল্যের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করবার চেষ্টা করছেন তার তুলনায় আমাদের কৃত্য নিতান্ত লঘু এবং বাহ্যিক হয়ে পাছে লজ্জা বাড়িয়ে তোলে। হৃদয়ের আবেগকে কোনো একটা অস্থায়ী দিনের সামান্য দুঃখের লক্ষণে ক্ষীণ রেখায় চিহ্নিত করে কর্তব্য মিটিয়ে দেবার মতো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে।

আমরা উপবাসের অনুষ্ঠান করব, কেননা মহাত্মাজি উপবাস

করতে বসেছেন— এই দুটোকে কোনো অংশেই যেন একত্রে তুলনা করবার মূঢ়তা কারও মনে না আসে। এ দুটো একেবারেই এক জিনিস নয়। তাঁর উপবাস, সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে একটি বাণী, চরম ভাষার বাণী। মৃত্যু তাঁর সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্বের কাছে, ঘোষণা করবে চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই যদি গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য হয় তবে তা যথোচিত ভাবে করতে হবে। তপস্যার সত্যকে তপস্যার দ্বারাই অন্তরে গ্রহণ করা চাই।

আজ তিনি কী বলছেন সেটা চিন্তা করে দেখো। পৃথিবীময় মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি, এক দল মানুষ আর-এক দলকে নীচে ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতি প্রচার করে। আপন দলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্য দলের দাসত্বের উপরে। মানুষ দীর্ঘ কাল ধরে এই কাজ করে এসেছে। কিন্তু তবু বলব এটা অমানুষিক। তাই দাসনির্ভরতার ভিত্তির উপরে মানুষের ঐশ্বর্য স্থায়ী হতে পারে না। এতে কেবল যে দাসেদের দুর্গতি হয় তা নয়, প্রভুদেরও এতে বিনাশ ঘটায়। যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি তারাই আমাদের সম্মুখপথে পদক্ষেপের বাধা। তারা গুরুভারে আমাদের নীচের দিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীন করি তারা ক্রমশই আমাদের হেয় করে। মানুষ-খেগো সভ্যতা রোগে

জীর্ণ হবে, মরবে। মানুষের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ষে মানুষোচিত সম্মান থেকে যাদের আমরা বঞ্চিত করেছি তাদের অগৌরবে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েছি।

আজ ভারতে কত সহস্র লোক কারাগারে রুদ্ধ, বন্দী। মানুষ হয়ে পশুর মতো তারা পীড়িত, অবমানিত। মানুষের এই পুঞ্জীভূত অবমাননা সমস্ত রাজ্যশাসনতন্ত্রকে অপমানিত করছে, তাকে গুরুভারে দুরূহ করছে। তেমনি আমরাও অসম্মানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেছি সমাজের বৃহৎ এক দলকে। তাদের হীনতার ভার বহন করে আমরা এগোতে পারছি নে। বন্দীদশা শুধু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মানুষের অধিকার-সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন। সম্মানের খর্বতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষে সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেছি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি পাব কী করে? যারা মুক্তি দেয় তারাই তো মুক্ত হয়।

এত দিন এইভাবে চলছিল; ভালো করে বুঝি নি আমরা কোথায় তলিয়ে ছিলাম। সহসা ভারতবর্ষ আজ মুক্তির সাধনায় জেগে উঠল। পণ করলাম, চিরদিন বিদেশী শাসনে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময় দেখিয়ে দিলেন কোথায় আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহ্বরগুলো। আজ ভারতে মুক্তিসাধনার তাপস যাঁরা তাঁদের

সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেছি। যারা ছোটো হয়েছিল তারাই আজ বড়োকে করেছে অকৃতার্থ। তুচ্ছ বলে যাদের আমরা মেরেছি তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারছে।

এক ব্যক্তির সঙ্গে আর-এক ব্যক্তির শক্তির স্বাভাবিক উচ্চনীচতা আছে। জাতিবিশেষের মধ্যেও তেমন দেখা যায়। উন্নতির পথে সকলে সমান দূর এগোতে পারে নি। সেইটেকে উপলক্ষ্য করে সেই পশ্চাদ্‌বর্তীদেরকে অপমানের দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া তুলে দিয়ে স্থায়ী ভাবে যখনই পিছিয়ে রাখা যায় তখনই পাপ জমা হয়ে ওঠে। তখনই অপমানবিষ দেশের এক অঙ্গ থেকে সর্ব অঙ্গে সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনি করে মানুষের সম্মান থেকে যাদের নির্বাসিত করে দিলুম তাদের আমরা হারালুম। আমাদের দুর্বলতা ঘটল সেইখানেই, সেইখানেই শনির রন্ধ্র। এই রন্ধ্র দিয়েই ভারতবর্ষের পরাভব তাকে বারে বারে নত করে দিয়েছে। তার ভিতের গাঁথুনি আল্‌গা, আঘাত পাবা মাত্র ভেঙে ভেঙে পড়েছে। কালক্রমে যে ভেদ দূর হতে পারত তাকে আমরা চেষ্টা ক'রে, সমাজরীতির দোহাই দিয়ে, স্থায়ী করে তুলেছি। আমাদের রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনা কেবলই ব্যর্থ হচ্ছে এই ভেদবুদ্ধির অভিশাপে।

যেখানেই এক দলের অসম্মানের উপর আর-এক দলের

সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই ভারসামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে বিপদ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যায়, সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম। য়ুরোপে এক রাষ্ট্রজাতির মধ্যে অন্য ভেদ যদি বা না থাকে, শ্রেণীভেদ আছে। শ্রেণীভেদে সম্মান ও সম্পদের পরিবেষণ সমান হয় না। সেখানে তাই ধনিকের সঙ্গে কর্মিকের অবস্থা যতই অসমান হয়ে উঠছে ততই সমাজ টলমল করছে। এই অসাম্যের ভারে সেখানকার সমাজব্যবস্থা প্রত্যহই পীড়িত হচ্ছে। যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই। মানুষ যেখানেই মানুষকে পীড়িত করবে সেখানেই তার সমগ্র মনুষ্যত্ব আহত হবেই ; সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়।

সমাজের মধ্যেকার এই অসাম্য, এই অসম্মানের দিকে, মহাত্মাজি অনেক দিন থেকে আমাদের লক্ষ নির্দেশ করেছেন। তবুও তেমন একান্ত চেষ্টায় এই দিকে আমাদের সংস্কারকার্য প্রবর্তিত হয় নি। চরখা ও খদ্দরের দিকে আমরা মন দিয়েছি, আর্থিক দুর্গতির দিকে দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু সামাজিক পাপের দিকে নয়। সেই জন্যেই আজ এই দুঃখের দিন এল। আর্থিক দুঃখ অনেকটা এসেছে বাইরে থেকে, তাকে ঠেকানো একান্ত কঠিন না হতে পারে। কিন্তু যে সামাজিক পাপের উপর আমাদের সকল শত্রুর আশ্রয় তাকে উৎপাটন করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপরে আমাদের মমত্ব। সেই প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে

মহাত্মা গান্ধী

আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণক্ষেত্রে তাঁর দেহের অবসান ঘটতেও পারে। কিন্তু, সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে যাবেন। যদি তাঁর হাত থেকে আজ আমরা সর্বান্তঃকরণে সেই দান গ্রহণ করতে পারি তবেই আজকের দিন সার্থক হবে। এত বড়ো আহ্বানের পরেও যারা একদিন উপবাস করে তার পরদিন হতে উদাসীন থাকবে, তারা দুঃখ থেকে যাবে দুঃখে, দুর্ভিক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষে। সামান্য কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা সত্যসাধনার অবমাননা যেন না করি।

মহাত্মাজির এই ব্রত আমাদের শাসনকর্তাদের সংকল্পকে কী পরিমাণে ও কী ভাবে আঘাত করবে জানি নে। আজ সেই পোলিটিকাল তর্ক-অবতারণার দিন নয়। কেবল একটা কথা বলা উচিত বলে বলব। দেখতে পাচ্ছি, মহাত্মাজির এই চরম উপায়-অবলম্বনের অর্থ অধিকাংশ ইংরেজ বুঝতে পারছেন না। না পারবার একটা কারণ এই যে, মহাত্মাজির ভাষা তাঁদের ভাষা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ ঘটাবার বিরুদ্ধে মহাত্মাজির এই প্রাণপণ প্রয়াস তাঁদের প্রয়াসের প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না বলেই এটাকে এত অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি— আয়র্লণ্ড্ যখন ব্রিটিশ ঐক্যবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করেছিল তখন কী বীভৎস

ব্যাপার ঘটেছিল। কত রক্তপাত, কত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। পলিটিক্‌সে এই হিংস্র পদ্ধতিই পশ্চিম-মহাদেশে অভ্যস্ত। সেই কারণে আয়ার্লণ্ডে রাষ্ট্রিক প্রয়াসের এই রক্তাক্ত মূর্তি তো কারও কাছে, অন্তত অধিকাংশ লোকের কাছে, আর যাই হোক, অদ্ভুত বলে মনে হয় নি। কিন্তু অদ্ভুত মনে হচ্ছে মহাত্মাজির অহিংস্র আত্মত্যাগী প্রয়াসের শান্ত মূর্তি। ভারতবর্ষের অবমানিত জাতির প্রতি মহাত্মাজির মমতা নেই, এত বড়ো অমূলক কথা মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে তার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের রাজসিংহাসনের উপর সংকটের ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। রাজপুরুষদের মন বিকল হয়েছে বলেই এমন কথা তাঁরা কল্পনা করতে পেরেছেন। এ কথা বুঝতে পারেন নি, রাষ্ট্রিক অস্ত্রাঘাতে হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম বিপদের নয়। একদা বাহির থেকে কোনো তৃতীয় পক্ষ এসে যদি ইংলণ্ডে প্রটেস্টাণ্ট্‌ ও রোমান-ক্যাথলিকদের এই ভাবে সম্পূর্ণ বিভক্ত করে দিত তা হলে সেখানে একটা নরহত্যার ব্যাপার ঘটা অসম্ভব ছিল না। এখানে হিন্দুসমাজের পরম সংকটের সময় মহাত্মাজির দ্বারা সেই বহুপ্রাণঘাতক যুদ্ধের ভাষান্তর ঘটেছে মাত্র। প্রটেস্টাণ্ট্‌ ও রোমান-ক্যাথলিকদের মধ্যে বহুদীর্ঘকাল যে অধিকারভেদ চলে এসেছিল, সমাজই আজ স্বয়ং তার সমাধান করেছে; সে জন্যে তুর্কির বাদশাকে ডাকে নি। আমাদের দেশের

মহাত্মা গান্ধী

সামাজিক সমস্যা-সমাধানের ভার আমাদের 'পরেই থাকার প্রয়োজন ছিল।

রাষ্ট্রব্যাপারে মহাত্মাজি যে অহিংস্রনীতি এত কাল প্রচার করেছেন, আজ তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত, এ কথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করি নে।

শান্তিনিকেতন
৪ আশ্বিন ১৩৩৯

মহাত্মাজির পুণ্যব্রত

যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাই নে। যখন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য। আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই; কত পীড়ন, কত দৈন্য, কত রোগ শোক তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি; দুঃখ জমে উঠেছে রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ। যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করছি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নেই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।

যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা যখন আসেন, আমরা ভালো করে চিনতে পারি নে তাঁদের। কেননা, আমাদের মন ভীরু অস্বচ্ছ, স্বভাব শিথিল, অভ্যাস দুর্বল। মনেতে সেই সহজ শক্তি নেই যাতে করে মহৎকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি, গ্রহণ করতে পারি। বারে বারে এমন ঘটেছে, যাঁরা সকলের বড়ো তাঁদেরই সকলের চেয়ে দূরে ফেলে রেখেছি।

যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, কঠোর তপস্বী, তাঁদের বোঝা সহজ নয়; কেননা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কার তাঁদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে কঠিন লাগে না, সেটা ভালোবাসা। যে মহাপুরুষ ভালোবাসা দিয়ে নিজের পরিচয় দেন, তাঁকে আমাদের

ভালোবাসায় আমরা এক রকম করে বুঝতে পারি। সে জন্যে ভারতবর্ষে এই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল যে, এবার বুঝেছি। এমনটি সচরাচর ঘটে না। যিনি আমাদের মধ্যে এসেছেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেছি, তাঁকে জেনেছি। সকলে বুঝেছে 'তিনি আমার'। তাঁর ভালোবাসায় উচ্চ-নীচের ভেদ নেই, মূর্খ-বিদ্বানের ভেদ নেই, ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেছেন সকলের মধ্যে সমান ভাবে তাঁর ভালোবাসা। তিনি বলেছেন, সকলের কল্যাণ হোক, সকলের মঙ্গল হোক। যা বলেছেন, শুধু কথায় নয়, বলেছেন দুঃখের বেদনায়। কত পীড়া, কত অপমান তিনি সয়েছেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেছেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ-আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেছে। তাঁর দুঃখ নিজের বিষয়সুখের জন্যে নয়, স্বার্থের জন্যে নয়, সকলের ভালোর জন্যে। এই-যে এত মার খেয়েছেন, উল্টে কিছু বলেন নি কখনও, রাগ করেন নি। সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েছেন। শত্রুরা আশ্চর্য হয়ে গেছে ধৈর্য দেখে, মহত্ত্ব দেখে। তাঁর সংকল্প সিদ্ধ হল, কিন্তু জোর-জবরদস্তিতে নয়। ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েছেন। সেই তিনি আজ ভারতবর্ষের দুঃখের বোঝা নিজের দুঃখের বেগে ঠেলবার জন্যে দেখা দিয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধী

তোমরা সকলে তাঁকে দেখেছ কি না জানি না। কারও কারও হয়তো তাঁকে দেখার সৌভাগ্য ঘটেছে। কিন্তু তাঁকে জান সকলেই, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে। সবাই জান, সমস্ত ভারতবর্ষ কিরকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েছে; একটি নাম দিয়েছে— মহাত্মা। আশ্চর্য, কেমন করে চিনলে! মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোনো মানে নেই। কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েছে, তার মানে আছে। যাঁর আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা। যাদের আত্মা ছোটো, বিষয়ে বদ্ধ, টাকাকড়ি-ঘরসংসারের চিন্তায় যাদের মন আচ্ছন্ন, তারা দীনাত্মা। মহাত্মা তিনিই, সকলের সুখ দুঃখ যিনি আপনার করে নিয়েছেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো বলে জানেন। কেননা, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্তলোকে সেই দিব্য ভালোবাসা সেই প্রেমের ঐশ্বর্য দৈবাৎ মেলে। সেই প্রেম যাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁকে আমরা মোটের উপর এই বলে বুঝেছি যে, তিনি হৃদয় দিয়ে সকলকে ভালোবেসেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না, ভালো করে চিনতে একটু বাধা লাগে। বাঁকা হয়ে গেছে আমাদের মন। সত্যকে স্বীকার করতে ভীরুতা দ্বিধা সংশয় আমাদের জাগে। বিনা ক্লেশে যা মানতে পারি তাই মানি, কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে দিই এক পাশে। তাঁর সকলের

চেয়ে বড়ো সত্যটাকে নিতে পারলুম না। এইখানেই তাঁকে মারলুম। তিনি এসেছেন, ফিরে গেলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিতে পারলুম না।

খৃস্টানশাস্ত্রে পড়েছি, আচারনিষ্ঠ য়িহুদিরা যীশুখৃস্টকে শত্রু বলে মেরেছিল। কিন্তু মার কি শুধু দেহের ? যিনি প্রাণ দিয়ে কল্যাণের পথ খুলে দিতে আসেন, সেই পথকে বাধাগ্রস্ত করা সেও কি মার নয় ? সকলের চেয়ে বড়ো মার সেই। কী অসহ্য বেদনা অনুভব করে তিনি আজকের দিনে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেছেন। সেই ব্রতকে যদি আমরা স্বীকার করে না নিই, তবে কি তাঁকে আমরা মারলুম না ? আমাদের ছোটো মনের সংকোচ, ভীরুতা, আজ লজ্জা পাবে না ? আমরা কি তাঁর সেই বেদনাকে মর্মের মধ্যে ঠিক জায়গায় অনুভব করতে পারব না ? গ্রহণ করতে পারব না তাঁর দান ? এত সংকোচ, এত ভীরুতা আমাদের ? সে ভীরুতার দৃষ্টান্ত তো তাঁর মধ্যে কোথাও নেই। সাহসের অন্ত নেই তাঁর ; মৃত্যুকে তিনি তুচ্ছ করেছেন। কঠিন কারাগার, তার সমস্ত লোহার শিকল নিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে ঠেকাতে পারে নি। সেই তিনি এসেছেন আজ আমাদের মাঝখানে। আমরা যদি ভয়ে পিছিয়ে পড়ি, তবে লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না। তিনি আজ মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেছেন ছোটো-বড়োকে এক করবার জন্যে। তাঁর সেই সাহস, তাঁর সেই শক্তি, আসুক

আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের কাজে। আমরা যেন আজ গলা ছেড়ে বলতে পারি, 'তুমি যেয়ো না, আমরা গ্রহণ করলাম তোমার ব্রত।' তা যদি না পারি, এত বড়ো জীবনকে যদি ব্যর্থ হতে দিই, তবে তার চেয়ে বড়ো সর্বনাশ আর কী হতে পারে ?

আমরা এই কথাই বলে থাকি যে, বিদেশীরা আমাদের শত্রুতা করছে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো শত্রু আছে আমাদের মজ্জার মধ্যে, সে আমাদের ভীরুতা। সেই ভীরুতাকে জয় করার জন্যে বিধাতা আমাদের শক্তি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে ; তিনি আপন অভয় দিয়ে আমাদের ভয় হরণ করতে এসেছেন। সেই তাঁর দান-সুদ্ধ তাঁকে আজ কি আমরা ফিরিয়ে দেব ? এই কৌপীনধারী আমাদের দ্বারে দ্বারে আঘাত করে ফিরেছেন, তিনি আমাদের সাবধান করেছেন কোন্‌খানে আমাদের বিপদ। মানুষ যেখানে মানুষের অপমান করে, মানুষের ভগবান সেইখানেই বিমুখ। শত শত বছর ধরে মানুষের প্রতি অপমানের বিষ আমরা বইয়ে দিয়েছি ভারতবর্ষের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি শত শত নত মস্তকের উপরে ; তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত, দুর্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি নে। আমাদের চলবার রাস্তায় পদে পদে পঙ্ককুণ্ড তৈরি করে রেখেছি ; আমাদের সৌভাগ্যের অনেকখানি তলিয়ে যাচ্ছে তারই মধ্যে। এক ভাই আর-এক ভাইয়ের

কপালে স্বহস্তে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে, মহাত্মা সইতে পারেন নি এই পাপ।

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শোনো তাঁর বাণী। অনুভব করো, কী প্রচণ্ড তাঁর সংকল্পের জোর। আজ তপস্বী উপবাস আরম্ভ করেছেন, দিনের পর দিন তিনি অন্ন নেবেন না। তোমরা দেবে না তাঁকে অন্ন? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অন্ন, তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে। অপরাধ অনেক করেছি, পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবহার করেছি দাসের মতো, পশুর মতো। সেই অপমানে সমস্ত পৃথিবীর কাছে ছোটো করে রেখেছে আমাদের। যদি তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতাম তা হলে আজ এত দুর্গতি হত না আমাদের। পৃথিবীর অন্য-সব সমাজকে লোকে সম্মান করে, ভয় করে, কেননা তারা পরস্পর ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ। আমাদের এই হিন্দুসমাজকে আঘাত করতে, অপমান করতে, কারও মনে ভয় নেই, বার বার তার প্রমাণ পাই। কিসের জোরে তাদের এই স্পর্ধা সে কথাটা যেন এক মূহূর্ত্ত না ভুলি।

যে সম্মান মহাত্মাজি সবাইকে দিতে চেয়েছেন, সে সম্মান আমরা সকলকে দেব। যে পারবে না দিতে, ধিক্ তাকে। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধা দেয় যে সমাজ, ধিক্ সেই জীর্ণ সমাজকে। সব চেয়ে বড়ো ভীরুতা তখনই প্রকাশ পায়

যখন সত্যকে চিনতে পেরেও মানতে পারি নে। সে ভীরুতার ক্ষমা নেই।

অভিশাপ অনেক দিন থেকে আছে দেশের উপর। সেই জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছেন একজন। সেই প্রায়শ্চিত্তে সকলকে মিলতে হবে, সেই মিলনেই আমাদের চিরমিলন শুরু হবে। মৃত্যুর বৃহৎ পাত্রে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত তিনি আমাদের সকলের সামনে ধরলেন, এগিয়ে দিলেন আমাদের হাতের কাছে। গ্রহণ করো সকলে, ক্ষালন করো পাপ। মঙ্গল হবে। তাঁর শেষ কথা আজ আমি তোমাদের শোনাতে এসেছি। তিনি দূরে আছেন, কিন্তু তিনি দূরে নেই। তিনি আমাদের অন্তরেই আছেন। যদি জীবন দিতে হয় তাঁকে আমাদের জন্যে, তবে অন্ত থাকবে না পরিতাপের।

মাথা হেঁট হয়ে যাবে আমাদের। তিনি আমাদের কাছে যা চেয়েছেন, তা দুরূহ, দুঃসাধ্য ব্রত। কিন্তু তার চেয়ে দুঃসাধ্য কাজ তিনি করেছেন, তার চেয়ে কঠিন ব্রত তাঁর। সাহসের সঙ্গে যেন গ্রহণ করতে পারি তাঁর দেওয়া ব্রত। যাকে আমরা ভয় করছি সে কিছুই নয়। সে মায়া, মিথ্যা। সে সত্য নয়; মানব না আমরা তাকে। বলো আজ সবাই মিলে, আমরা মানব না সেই মিথ্যাকে। বলো আজ সমস্ত হৃদয় দিয়ে বলো, ভয় কিসের? তিনি সমস্ত ভয় হরণ করে বসে আছেন। মৃত্যুভয়কে জয়

করেছেন। কোনো ভয় যেন আজ থাকে না আমাদের। লোক-ভয়, রাজভয়, সমাজভয়, কিছুতেই যেন সংকুচিত না হই আমরা। তাঁর পথে তাঁরই অনুবর্তী হয়ে চলব, পরাভব ঘটতে দেব না তাঁর। সমস্ত পৃথিবী আজ তাকিয়ে আছে। যাদের মনে দরদ নেই তারা উপহাস করছে। এত বড়ো ব্যাপারটা সত্যিই উপহাসের বিষয় হবে, যদি আমাদের উপরে কোনে' ফল না হয়। সমস্ত পৃথিবী আজ বিস্মিত হবে, যদি তাঁর শক্তির আগুন আমাদের সকলের মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে; যাদ সবাই বলতে পারি, 'জয় হোক তপস্বী, তোমার তপস্যা সার্থক হোক।' এই জয়ধ্বনি সমুদ্রের এক পার থেকে পৌঁছবে আর-এক পারে; সকলে বলবে, সত্যের বাণী অমোঘ। ধন্য হবে ভারতবর্ষ। আজকের দিনেও এত বড়ো সার্থকতায় যে বাধা দেবে সে অত্যন্ত হেয়; তাকে তোমরা ভয়ে যদি মান তবে তার চেয়ে হেয় হবে তোমরা।

জয় হোক সেই তপস্বীর যিনি এই মুহূর্তে বসে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে, সমস্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে। তোমরা জয়ধ্বনি করো তাঁর, তোমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছক তাঁর আসনের কাছে। বলো, 'তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সত্যকে স্বীকার করলেম।'

মহাত্মা গান্ধী

আমি কীই বা বলতে পারি। আমার ভাষায় জোর কোথায়। তিনি যে ভাষায় বলছেন সে কানে শোনবার নয়, সে প্রাণে শোনবার ; মানুষের সেই চরম ভাষা, নিশ্চয়ই তোমাদের অন্তরে পোঁচেছে।

আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য, পর যখন আপন হয়। সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ, আপন যখন পর হয়। ইচ্ছে করেই যাদের আমরা হারিয়েছি, ইচ্ছে করেই আজ তাদের ফিরে ডাকো ; অপরাধের অবসান হোক, অমঙ্গল দূর হয়ে যাক। মানুষকে গৌরবদান করে মনুষ্যত্বের সগৌরব অধিকার লাভ করি।

শান্তিনিকেতন
৫ আশ্বিন ১৩৩৯

ব্রত-উদ্‌যাপন

গভীর উদ্‌বেগের মধ্যে, মনে আশা নিয়ে, পুনা অভিমুখে যাত্রা করলেম। দীর্ঘ পথ, যেতে যেতে আশঙ্কা বেড়ে ওঠে, পৌঁছে কী দেখা যাবে। বড়ো স্টেশনে এলেই আমার সঙ্গী দুজনে খবরের কাগজ কিনে দেন, উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে দেখি। সুখবর নয়। ডাক্তারেরা বলছে, মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা danger zoneএ পৌঁচেছে। দেহেতে মেদ বা মাংসের উদ্‌বৃত্ত এমন নেই যে দীর্ঘ কালের ক্ষয় সহ্য হয়, অবশেষে মাংসপেশী ক্ষয় হতে আরম্ভ করেছে। apoplexy হয়ে অকস্মাৎ প্রাণহানি ঘটতে পারে। সেই সঙ্গে কাগজে দেখছি, দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে জটিল সমস্যা নিয়ে তাঁকে স্বপক্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে গুরুতর আলোচনা চালাতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হিন্দুসমাজের অন্তর্গত রূপেই অনুন্নত সমাজকে রাষ্ট্রনৈতিক বিশেষ অধিকার দেওয়া বিষয়ে দুই পক্ষকে তিনি রাজি করেছেন। দেহের সমস্ত যন্ত্রণা দুর্বলতাকে জয় করে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন; এখন বিলেত হতে এই ব্যবস্থা মঞ্জুর হওয়ার উপর সব নির্ভর করছে। মঞ্জুর না হওয়ার কোনো সংগত কারণ থাকতে পারে না; কেননা প্রধান মন্ত্রীর কথাই ছিল, অনুন্নত সমাজের সঙ্গে একযোগে

হিন্দুরা যে ব্যবস্থা মেনে নেবে তাকে তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য।

আশানৈরাশ্যে আন্দোলিত হয়ে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর প্রাতে আমরা কল্যাণ স্টেশনে পৌঁছলেম। সেখানে শ্রীমতী বাসন্তী ও শ্রীমতী ঊর্মিলার সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা অন্য গাড়িতে কলকাতা থেকে কিছু পূর্বে এসে পৌঁচেছেন। কালবিলম্ব না করে আমাদের ভাবী গৃহস্বামিনীর প্রেরিত মোটরগাড়িতে চড়ে পুনার পথে চললেম।

পুনার পার্বত্য পথ রমণীয়। পুরদ্বারে যখন পৌঁছলেম, তখন সামরিক অভ্যাসের পালা চলেছে— অনেকগুলি armoured car, machine gun, এবং পথে পথে সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ চোখে পড়ল। অবশেষে শ্রীযুক্ত বিঠলভাই থ্যাকার্‌সে মহাশয়ের প্রাসাদে গাড়ি থামল। তাঁর বিধবা পত্নী সৌম্যসহাস্য মুখে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে চললেন। সিঁড়ির দু পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গান করে অভিনন্দন জানালেন।

গৃহে প্রবেশ করেই বুঝেছিলেম, গভীর একটি আশঙ্কায় হাওয়া ভারাক্রান্ত। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার ছায়া। প্রশ্ন করে জানলেম, মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা সংকটাপন্ন। বিলাত হতে তখনও খবর আসে নি। প্রধান মন্ত্রীর নামে আমি একটি

জরুরি তার পাঠিয়ে দিলেম।

দরকার ছিল না পাঠাবার। শীঘ্রই জনরব কানে এল, বিলাত থেকে সম্মতি এসেছে। কিন্তু জনরব সত্য কি না তার প্রমাণ পাওয়া গেল বহু ঘণ্টা পরে।

মহাত্মাজির মৌনাবলম্বনের দিন আজ। একটার পরে কথা বলবেন। তাঁর ইচ্ছা, সেই সময়ে আমি কাছে থাকি। পথে যেতে যারবেদা জেলের খানিক দূরে আমাদের মোটর গাড়ি আটকা পড়ল; ইংরেজ সৈনিক বললে, কোনো গাড়ি এগোতে দেবার হুকুম নেই। আজকের দিনে জেলখানায় প্রবেশের পথ ভারতবর্ষে প্রশস্ত বলেই তো জানি। গাড়ির চতুর্দিকে নানা লোকের ভিড় জমে উঠল।

আমাদের পক্ষ হতে লোক জেলের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিতে খানিক এগিয়ে যেতেই শ্রীমান দেবদাস এসে উপস্থিত, জেল-প্রবেশের ছাড়পত্র তাঁর হাতে। পরে শুনলেম, মহাত্মাজি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কেননা তাঁর হঠাৎ মনে হয়, পুলিশ কোথাও আমাদের গাড়ি আটকেছে— যদিও তার কোনো সংবাদ তাঁর জানা ছিল না।

লোহার দরজা একটার পর একটা খুলল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। সামনে দেখা যায় উঁচু দেয়ালের ঔদ্ধত্য, বন্দী আকাশ, সোজা-লাইন-করা বাঁধা রাস্তা, দুটো চারটে গাছ।

তুটো জিনিসের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে বিলম্বে ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পেরিয়ে ঢুকেছি সম্প্রতি। জেলখানায় প্রবেশে আজ বাধা ঘটলেও অবশেষে এসে পৌঁছনো গেল।

বাঁ দিকে সিঁড়ি উঠে, দরজা পেরিয়ে, দেয়ালে-ঘেরা একটি অঙ্গনে প্রবেশ করলেম। দূরে দূরে তু-সারি ঘর। অঙ্গনে একটি ছোটো আমগাছের ঘনছায়ায় মহাত্মাজি শয্যাশায়ী।

মহাত্মাজি আমাকে তুই হাতে বুকের কাছে টেনে নিলেন, অনেক ক্ষণ রাখলেন। বললেন, কত আনন্দ হল।

শুভ সংবাদের জোয়ার বেয়ে এসেছি, এ জন্যে আমার ভাগ্যের প্রশংসা করলেম তাঁর কাছে। তখন বেলা দেড়টা। বিলাতের খবর ভারতময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে; রাজনৈতিকের দল তখন সিমলায় দলিল নিয়ে প্রকাশ্য সভায় আলোচনা করছিলেন, পরে শুনলেম। খবরের কাগজওয়ালারাও জেনেছে। কেবল যাঁর প্রাণের ধারা প্রতি মুহূর্তে শীর্ণ হয়ে মৃত্যুসীমায় সংলগ্ন-প্রায় তাঁর প্রাণসংকট-মোচনের যথেষ্ট সত্বরতা নেই। অতি দীর্ঘ লাল ফিতের জটিল নির্মমতায় বিস্ময় অনুভব করলেম। সওয়া চারটে পর্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রতিক্ষণ বেড়ে চলতে লাগল। শুনতে পাই, দশটার সময় খবর পুনায় এসেছিল।

চতুর্দিকে বন্ধুরা রয়েছেন। মহাদেব, বল্লভভাই, রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এঁদের লক্ষ্য করলেম। শ্রীমতী

কস্তুরীবাঈ এবং সরোজিনীকে দেখলেম। জওহরলালের পত্নী কমলাও ছিলেন।

মহাত্মাজির স্বভাবতই শীর্ণ শরীর শীর্ণতম, কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যায় না। জঠরে অম্ল জমে উঠেছে, তাই মধ্যে মধ্যে সোডা মিশিয়ে জল খাওয়ানো হচ্ছে। ডাক্তারদের দায়িত্ব অতিমাত্রায় পৌঁচেছে।

অথচ চিত্তশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি। চিন্তার ধারা প্রবহমান, চৈতন্য অপরিশ্রান্ত। প্রায়োপবেশনের পূর্ব হতেই কত দুরূহ ভাবনা, কত জটিল আলোচনায় তাঁকে নিয়ত ব্যাপৃত হতে হয়েছে। সমুদ্রপারের রাজনৈতিকদের সঙ্গে পত্রব্যবহারে মনের উপর কঠোর ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে। উপবাসকালে নানান দলের প্রবল দাবি তাঁর অবস্থার প্রতি মমতা করে নি, তা সকলেই জানেন। কিন্তু মানসিক জীর্ণতার কোনো চিহ্নই তো নেই। তাঁর চিন্তার স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রকাশধারায় আবিলতা ঘটে নি। শরীরের কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েও আত্মার অপরাজিত উদ্যমের এই মূর্তি দেখে আশ্চর্য হতে হল। কাছে না এলে এমন করে উপলব্ধি করতেম না, কত প্রচণ্ড শক্তি এই ক্ষীণদেহ পুরুষের।

আজ ভারতবর্ষের কোটি প্রাণের মধ্যে পৌঁছল মৃত্যুর বেদীতল-শায়ী এই মহৎ প্রাণের বাণী। কোনো বাধা তাকে

ঠেকাতে পারল না— দূরত্বের বাধা, ইঁটকাঠ-পাথরের বাধা, প্রতিকূল পলিটিক্‌সের বাধা। বহু শতাব্দীর জড়ত্বের বাধা আজ তার সামনে ধূলিসাৎ হল।

মহাদেব বললেন, আমার জন্যে মহাত্মাজি একান্তমনে অপেক্ষা করছিলেন। আমার উপস্থিতি দ্বারা রাষ্ট্রিক সমস্যার মীমাংসা-সাধনে সাহায্য করতে পারি এমন অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাঁকে যে তৃপ্তি দিতে পেরেছি, এই আমার আনন্দ।

সকলে ভিড় করে দাঁড়ালে তাঁর পক্ষে কষ্টকর হবে মনে করে আমরা সরে গিয়ে বসলেম। দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করছি কখন খবর এসে পৌঁছবে। অপরাহ্নের রৌদ্র আড় হয়ে পড়েছে ইঁটের প্রাচীরের উপর। এখানে ওখানে দু-চারজন শুভ্র-খদ্দর-পরিহিত পুরুষ নারী শান্ত ভাবে আলোচনা করছেন।

লক্ষ্য করবার বিষয়, কারাগারের মধ্যে এই জনতা। কারও ব্যবহারে প্রশ্রয়জনিত শৈথিল্য নেই। চরিত্রশক্তি বিশ্বাস আনে, জেলের কর্তৃপক্ষ তাই শ্রদ্ধা করেই এঁদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মেলামেশা করতে দিতে পেরেছেন। এঁরা মহাত্মাজির প্রতিশ্রুতির প্রতিকূলে কোনো সুযোগ গ্রহণ করেন নি। আত্মমর্যাদার দৃঢ়তা এবং অচাঞ্চল্য এঁদের মধ্যে পরিস্ফুট। দেখলেই বোঝা যায়, ভারতের স্বরাজ্য-সাধনার যোগ্য সাধক এঁরা।

অবশেষে জেলের কর্তৃপক্ষ গবর্মেণ্টের ছাপ-মারা মোড়ক হাতে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখেও আনন্দের আভাস পেলুম। মহাত্মাজি গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন। সরোজিনীকে বললেম, এখন ওঁর চার পাশ থেকে সকলের সরে যাওয়া উচিত। মহাত্মাজি পড়া শেষ করে বন্ধুদের ডাকলেন। শুনলেম, তিনি তাঁদের আলোচনা করে দেখতে বললেন। এবং নিজের তরফ থেকে জানালেন, কাগজটা ডাক্তার আম্বেদকরকে দেখানো দরকার; তাঁর সমর্থন পেলে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হবেন।

বন্ধুরা এক পাশে দাঁড়িয়ে চিঠিখানি পড়লেন। আমাকেও দেখালেন। রাষ্ট্রবুদ্ধির রচনা, সাবধানে লিখিত, সাবধানেই পড়তে হয়। বুঝলেম, মহাত্মাজির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ নয়। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর 'পরে ভার দেওয়া হল চিঠিখানার বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মহাত্মাজিকে শোনাবেন। তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় মহাত্মাজির মনে আর কোনো সংশয় রইল না। প্রায়োপবেশনের ব্রত উদ্‌যাপন হল।

প্রাচীরের কাছে ছায়ায় মহাত্মাজির শয্যা সরিয়ে আনা হল। চতুর্দিকে জেলের কম্বল বিছিয়ে সকলে বসলেন। লেবুর রস প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী কমলা নেহেরু। Inspector-General of Prisons— যিনি গবর্মেণ্টের পত্র নিয়ে এসেছেন—

অনুরোধ করলেন, রস যেন মহাত্মাজিকে দেন শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ নিজের হাতে। মহাদেব বললেন 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো' গীতাঞ্জলির এই গানটি মহাত্মাজির প্রিয়। সুর ভুলে গিয়েছিলেম। তখনকার মতো সুর দিয়ে গাইতে হল। পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী বেদ পাঠ করলেন। তার পর মহাত্মাজি শ্রীমতী কস্তুরীবাঈয়ের হাত হতে ধীরে ধীরে লেবুর রস পান করলেন। পরিশেষে সবর্‌মতী-আশ্রমবাসীগণ এবং সমবেত সকলে 'বৈষ্ণব জন কো' গানটি গাইলেন। ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ হল, সকলে গ্রহণ করলেম।

জেলের অবরোধের ভিতর মহোৎসব। এমন ব্যাপার আর কখনও ঘটে নি। প্রাণোৎসর্গের যজ্ঞ হল জেলখানায়, তার সফলতা এইখানেই রূপ ধারণ করলে। মিলনের এই অকস্মাৎ আবির্ভূত অপরূপ মূর্তি, একে বলতে পারি যজ্ঞসম্ভবা।

রাত্রে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জ্রু প্রমুখ পুনার সমবেত বিশিষ্ট নেতারা এসে আমাকে ধরলেন, পরদিন মহাত্মাজির বার্ষিকী উৎসবসভায় আমাকে সভাপতি হতে হবে; মালব্যজিও বোম্বাই হতে আসবেন। মালব্যজিকেই সভাপতি ক'রে আমি সামান্য দু-চার কথা লিখে পড়ব, এই প্রস্তাব করলেম। শরীরের দুর্বলতাকেও অস্বীকার করে শুভদিনের এই বিরাট জনসভায়

যোগ দিতে রাজি না হয়ে পারলেম না।

বিকালে শিবাজিমন্দির-নামক বৃহৎ মুক্ত অঙ্গনে বিরাট জনসভা। অতি কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করলেম। ভাবলেম, অভিমন্যুর মতো প্রবেশ তো হল, বেরোবার কী উপায়। মালব্যজি উপক্রমণিকায় সুন্দর করে বোঝালেন তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় যে, অস্পৃশ্যবিচার হিন্দুশাস্ত্রসংগত নয়। বহু সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁর যুক্তি প্রমাণ করলেন। আমার কণ্ঠ ক্ষীণ, সাধ্য নেই এত বড়ো সভায় আমার বক্তব্য শ্রুতিগোচর করতে পারি। মুখে মুখে দু-চারটি কথা বললেম, পরে রচনা পাঠ করবার ভার নিলেন পণ্ডিতজির পুত্র গোবিন্দ মালব্য। ক্ষীণ অপরাহ্নের আলোকে অদৃষ্টপূর্ব রচনা অনর্গল অমন সুস্পষ্ট কণ্ঠে পড়ে গেলেন, এতে বিস্মিত হলেম।

আমার সমগ্র রচনা কাগজে আপনারা দেখে থাকবেন। সভায় প্রবেশ করবার অনতিপূর্বে তার পাণ্ডুলিপি জেলে গিয়ে মহাত্মাজির হাতে দিয়ে এসেছিলেম।

মতিলাল নেহেরুর পত্নী কিছু বললেন তাঁর ভ্রাতা-ভগিনীদের উদ্দেশ করে, সামাজিক সাম্যবিধানের ব্রত-রক্ষায় তাঁদের যেন একটুও ত্রুটি না ঘটে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ অন্যান্য নেতারাও অন্তরের ব্যথা দিয়ে দেশবাসীকে সামাজিক অশুচি দূর করতে আবাহন করলেন সভায় সমবেত বিরাট

জনসংঘ হাত তুলে অস্পৃশ্যতানিবারণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। বোঝা গেল, সকলের মনে আজকের বাণী পৌঁচেছে। কিছু দিন পূর্বেও এমন দুরূহ সংকল্পে এত সহস্র লোকের অনুমোদন সম্ভব ছিল না।

আমার পালা শেষ হল। পরদিন প্রাতে মহাত্মাজির কাছে অনেক ক্ষণ ছিলেম। তাঁর সঙ্গে এবং মালব্যজির সঙ্গে দীর্ঘকাল নানা বিষয়ে আলোচনা হল। এক দিনেই মহাত্মাজি অপ্রত্যাশিত বল লাভ করেছেন,। কণ্ঠস্বর তাঁর দৃঢ়তর, blood pressure প্রায় স্বাভাবিক। অতিথি অভ্যাগত অনেকেই আসছেন প্রণাম করে আনন্দ জানিয়ে যেতে। সকলের সঙ্গেই হেসে কথা কইছেন। শিশুর দল ফুল নিয়ে আসছে, তাদের নিয়ে তাঁর কী আনন্দ। বন্ধুদের সঙ্গে সামাজিক সাম্যবিধান প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা চলছে। এখন তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-ভঞ্জন।

আজ যে মহাত্মার জীবন আমাদের কাছে বিরাট ভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল, তাতে সর্বমানুষের মধ্যে মহামানুষকে প্রত্যক্ষ করবার প্রেরণা আছে। সেই প্রেরণা সার্থক হোক ভারতবর্ষের সর্বত্র।

মহাত্মা গান্ধী

মুক্তিসাধনার সত্য পথ মানুষের ঐক্যসাধনায়। রাষ্ট্রিক পরাধীনতা আমাদের সামাজিক সহস্র ভেদবিচ্ছেদকে অবলম্বন করেই পুষ্ট।

জড়প্রথার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে উদার ঐক্যের পথে মানবসভ্যতা অগ্রসর হবে, সেই দিন আজ সমাগত।